প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়

(শ্রীগদাধর-তত্ত্ব)

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণের পরে মায়ের আদেশে নীলাচলে বাস করিতে থাকেন। নীলাচলে যাওয়ার অল্প কিছুকাল পরে, শ্রীবিশ্বরূপের অনুসন্ধানের ব্যপদেশে দক্ষিণাঞ্চল উদ্ধারের জন্য গমন করেন। দক্ষিণাঞ্চল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণ রথযাত্রা-উপলক্ষে নীলাচলে গমন করেন; শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীও সেই সঙ্গে নীলাচলে যায়েন। চাতুর্ম্মাস্যের পরে গৌড়ীয় ভক্তগণ দেশে ফিরিয়া আসেন; কিন্তু গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী আসিলেন না। তিনি নীলাচলবাসের সঙ্কল্প করিয়া সেই স্থানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহার জন্য একটা স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; তিনি সেই স্থানে অবস্থান করিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা করিতে লাগিলেন; আর শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে ব্রজলীলা-রস আস্বাদন করাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে শ্রীবৃন্দাবন-দর্শনের জন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের ইচ্ছা হইল; শ্রীবৃন্দাবনের পথে, জননীর চরণ এবং গঙ্গা দর্শনের অভিপ্রায়ে তিনি গৌড় হইয়া যাওয়ার সংকল্প করিয়া যাত্রা করিলেন। গৌরগত-প্রাণ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। প্রভু তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন—"গদাধর, তুমি নীলাচলে বাসের সংকল্প করিয়াছ; সেই সংকল্প ত্যাগ করিওনা; ক্ষেত্রসন্ন্যাস ছাড়িওনা।" উত্তরে শ্রীগদাধর বলিলেন—"প্রভু, তুমি যেখানে থাক, সেখানেই নীলাচল; আমার ক্ষেত্রসন্ন্যাস রসাতলে যাউক, আমি তোমার সঙ্গেই যাইব।"—

"পণ্ডিত কহে যাঁহা তুমি সেই নীলাচল। ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল॥ চৈঃ চঃ ২।১৬।১৩০॥ প্রভু বলিলেন—গদাধর, তুমি নীলাচলে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা কর। পণ্ডিত বলিলেন—প্রভু, তোমার চরণদর্শনই কোটি-বিগ্রহ-সেবা। "প্রভু কহে ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন। পণ্ডিত কহে কোটি সেবা ত্বৎ-পাদ-দর্শন॥ ২।১৬।১৩১॥" প্রভু আবার বলিলেন—গদাধর, আমার জন্যই তুমি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছ; সুতরাং সেবাত্যাগের অপরাধ আমাতেই বর্ত্তিবে। তুমি এইস্থানে থাকিয়া গোপীনাথের সেবা কর, তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব। "প্রভু কহে সেবা ছাড়িবে, আমায় লাগে দোষ। ইহাঁ রহি সেবা কর আমার সন্তোষ॥ ২।১৬।১৩২॥" তদুত্তরে পণ্ডিত বলিলেন—ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ও সেবাত্যাগের অপরাধ আমি শিরোধার্য্য করিব, তাহা তোমাকে স্পর্শ করিবে না। আর, আমি তোমার সঙ্গেও যাইব না, একাকী যাইব—আমি তোমার জন্যও তোমার সঙ্গে যাইবনা, আমি যাব নদীয়াতে মায়ের চরণ দর্শন করিতে। "পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর। তোমার সঙ্গে না যাইব, যাব একেশ্বর॥ আই দেখিতে যাব, না যাব তোমা লাগি। প্রতিজ্ঞাসেবা-ত্যাগ-দোষ, তার আমি ভাগী॥ ২।১৬।১৩৩-৩৪॥"

এই বলিয়া শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী পৃথক্ ভাবে চলিলেন। প্রভু যখন কটকে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি গদাধরকে ডাকাইয়া তাঁহার নিকটে আনিলেন। এই ঘটনাকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার লিখিয়াছেন—"পণ্ডিতের গৌরাঙ্গপ্রেম বুঝন না যায়। প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়॥ ২।১৬।১৩৬॥" শ্রীগদাধরের আচরণে প্রভু অন্তরে সন্তুষ্টই হইয়াছেন; তথাপি বাহিরে প্রণয়-রোষ দেখাইয়া পণ্ডিতের হাতে ধরিয়া তিনি বলিলেন,—গদাধর, আমি বুঝিতে পারিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প এবং শ্রীগোপীনাথের সেবাত্যাগ করাই তোমার উদ্দেশ্য। তুমি ক্ষেত্র ছাড়িয়া কটক পর্য্যন্ত আসিয়াছ, সুতরাং ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প নষ্ট হইয়াছে। আর নীলাচল হইতে চলিয়া আসা অবধি শ্রীগোপীনাথের সেবাও করিতেছনা; সুতরাং সেবাত্যাগের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছে। "তাহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ। তার হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ॥ প্রতিজ্ঞাসেবা ছাড়িবে এই

তোমার উদ্দেশ। সেই সিদ্ধ হৈল ছাড়ি আইলে দূর দেশ॥ ২।১৬।১৩৭-৩৮॥" কিন্তু গদাধর, তুমি যে আমার সঙ্গে থাকিতে চাহিতেছ, তাহাতো কেবল তোমার নিজের সুখের জন্য বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ আমার নিষেধ সত্ত্বেও তুমি তোমার নিজের উদ্দেশ্য যাহাতে সিদ্ধ হয়, তাহাই করিলে; আমার নিষেধ শুনিলে না। তাতে দুটী ধর্ম্মই নষ্ট হইতেছে—নীলাচল-বাসের সঙ্কল্পরূপ ধর্ম্ম এবং শ্রীগোপীনাথের সেবারূপ ধর্ম্ম—এই উভয়ই নষ্ট হইতেছে; পণ্ডিত, তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি। গদাধর, প্রাণের গদাধর, তুমি যদি বাস্তবিক আমার সুখ বাসনা কর, তবে আমার কথা শুন, আর আমার সঙ্গে আসিও না—তুমি নীলাচলে ফিরিয়া যাও; আমার শপথ দিয়া বলিতেছি, তুমি আর দ্বিরুক্তি করিও না। "আমাসহ রহিতে চাহ বাঞ্ছ নিজ সুখ। তোমার দুই ধর্ম্ম যায়, আমার হয় দুখ॥ মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল। আমার শপথ যদি আর কিছু বোল॥ ২।১৬।১৩৯-৪০॥"

এই কথা বলিয়া, আর কোনও উত্তর শুনিবার অপেক্ষা না করিয়াই প্রভু নৌকায় চড়িয়া গৌড়ে যাত্রা করিলেন, পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিরহে অধীর হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিতকে নীলাচলে লইয়া যাওয়ার জন্য সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যকে প্রভু আদেশ করিলেন; সার্ব্বভৌম প্রভুর আদেশ পালন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৌড়যাত্রা-উপলক্ষে গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণ সম্বন্ধে এইরূপই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে। এখন, পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণের ও উক্তির তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। কেহ কেহ নাকি বলিতেছেন:—"শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীই যখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিতেছেন, 'কোটিগোপীনাথ-সেবা ত্বৎপাদদর্শন,' এবং পণ্ডিত-গোস্বামীই যখন 'প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা ছাড়িলেন তৃণপ্রায়,' আবার যখন 'তাঁহার চরিত্রে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ,' তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কোনও প্রয়োজন নাই, একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য।" এইরূপ সিদ্ধান্ত কতদূর সঙ্গত, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণ ও উক্তির মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে হইলে, বোধ হয়, তাঁহার স্বরূপ এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ, এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধের স্বরূপটী জানা একান্ত আবশ্যক।

নবদ্বীপলীলায় ও ব্রজলীলায় স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্য নাই—ইহারা একই লীলাপ্রবাহের দুইটী অংশ মাত্র। যে উদ্দেশ্যে রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণ লীলা-প্রকটন করেন, তাহার সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে, আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। শ্রীকৃষ্ণ যে রসিক-শেখর, তিনি যে প্রেমের বশীভূত, তিনি যে প্রেয়সী-পরতন্ত্র—তাহা শ্রীনবদ্বীপলীলাতেই পূর্ণতমরূপে প্রকটিত হইয়াছে। ব্রজে শারদীয় মহারাসে, "ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি" শ্লোকে তিনি কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরী-দিগের নিকট ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন; কিন্তু নবদ্বীপলীলায়, নিজেকে শ্রীরাধার মাদনাখ্য-মহাভাবের অধীন করিয়া কার্য্যতঃই ঋণী হইলেন। নিজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী-রাধিকার মাদনাখ্য-মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়া গৌর হইয়াছেন। পূর্ণতম মাধুর্য্যাস্বাদনের একমাত্র উপায় মাদনাখ্য-মহাভাব; এই মাদনাখ্য-মহাভাব শ্রীমতী-রাধিকা ব্যতীত অন্য কাহারও মধ্যে নাই; তাই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন:—"এই প্রেম দ্বারা নিত্য রাধিকা একলি। আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥ ১।৪।১২১॥"

যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ যখন স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য শ্রীমতীর মাদনাখ্য-মহাভাব গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইলেন, শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী তখনই তাঁহার প্রাণবল্লভকে তাহা দিলেন; শ্রীরাধিকার সমস্ত চেষ্টাই যে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—ইহা দ্বারা শ্রীভানুসুতা তাঁহার অসমোর্দ্ধ-প্রেমের কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়তার চরম-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন প্রেয়সী-পরতন্ত্রতাদির পূর্ণতম বিকাশ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতম কৃষ্ণত্ব প্রকটিত হইয়াছে, অপর দিকে কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তি-নিমিত্ত চেষ্টার চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের দ্বারা শ্রীরাধিকারও রাধিকাত্ব পূর্ণতমরূপে প্রকটিত হইয়াছে। "অতএব রাধিকা নাম বাখানে পুরাণে। কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপ করে আরাধনে। ১।৪।৭৫॥" শ্রীরাধিকা প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূর্ত্তির জন্য তাঁহাকে নিজের ভাব দিলেন, নিজের কান্তিও দিলেন—কান্তি দিয়া শ্যামসুন্দরকে গৌর করিলেন। ব্রজলীলায় শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী অনুরাগের প্রবল উৎকণ্ঠায়, তাঁহার প্রাণপ্রেষ্ঠ

শ্রীকৃষ্ণকে যে কোথায় রাখিবেন, তাহা যেন স্থির করিতে পারিতেছিলেন না; কাছে কাছে রাখিয়া তৃপ্ত হইতেন না, নয়নে নয়নে রাখিয়া তৃপ্ত হইতেন না, অঙ্গে অঙ্গে সংলগ্ন রাখিয়া তৃপ্ত হইতেন না; দৃঢ় আলিঙ্গনে বুকে চাপিয়া ধরিয়াও তৃপ্ত হইতেন না; কিছুতেই যেমন প্রাণের আশা মিটিত না; মনে হইত, বুঝিবা বুক চিরিয়া—হৃদয়ের ধনকে, তাঁহার যথাসর্ব্বস্বকে—হৃদয়ের অন্তস্তলে লুকাইয়া রাখিলেই কিছু তৃপ্তি পাইবেন; তিনি যেন তাহাই করিলেন—বুক চিরিয়াই যেন তাঁহার বুকের ধন শ্যামসুন্দরকে বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখিলেন; তাহাতেই যেন শ্যামের শ্যামরূপ হেম-গৌরাঙ্গীর হেমকান্তির অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। আর রসিকশেখর শ্যামসুন্দরও পরম আনন্দেই—রস-আস্বাদনের অদম্য পিপাসার তাড়নায় অখণ্ড প্রেমরসের মূল উৎস-স্বরূপ, এবং মাদনাখ্য-মহাভাব-গ্রহণের জন্য প্রবল উৎকণ্ঠায় ঐ ভাবের একমাত্র মূল ভাণ্ডার-স্বরূপ শ্রীরাধিকার হৃদয়-প্রকোষ্ঠে পরম আনন্দেই—আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; তিনি যেন ঐ গোপনীয় মণি-কুঠরীতেই আত্মগোপন করিয়াছেন—যেন মণি-কুঠরীর সর্ব্বস্বই লুঠ করিবেন, ইহাই তাঁহার সঙ্কল্প।

যাহা হউক শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী শ্রীকৃষ্ণকে নিজের ভাবটী দিলেন; কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবের কি প্রবল পরাক্রম, তাহা একমাত্র বৃষভানু-নন্দিনীই জানেন, অপর কেহ জানেন না; কৃষ্ণ তো জানেনই না, তাঁহার প্রাণ-প্রিয়সখীগণও তাহা জানেন না; কারণ, এই মাদনাখ্য-মহাভাবের আশ্রয় তাঁহারা কেহই নহেন। ইহাতে একদিকে যেমন অসমোর্দ্ধ আনন্দ, অপর দিকে আবার তেমনিই অসমোর্দ্ধ যন্ত্রণা; ইহারা যুগপৎ বর্ত্তমান—বিষামৃতে একত্রে মিলন। তাঁহার প্রাণপ্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ, এই মাদনাখ্য মহাভাবের অমৃতটুকু পূর্ণতমরূপে আস্বাদন করুন, ইহাই যেন শ্রীরাধিকার একান্ত ইচ্ছা; কিন্তু বিষটুকুর ছায়া-কণিকাও যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে না পারে, ইহাও তাঁহার প্রবলতর ইচ্ছা। কিন্তু উভয়ে—এই বিষ ও অমৃত—উভয়েই মহাভাবে নিত্য অবিচ্ছেদ্য ভাবে বর্ত্তমান; ইহাতে বিষ ছাড়িয়া অমৃত থাকিতে পারে না, অমৃত ছাড়িয়াও বিষ থাকিতে পারে না, ছাড়াছাড়ি হইলে এই অনির্ব্বচনীয় ভাবের অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যই নষ্ট হইয়া যায়। উৎকট ক্ষুধা এবং প্রচুর পরিমাণে লোভনীয় ভোজ্য-বস্তু যুগপৎ বর্ত্তমান না থাকিলে, ভোজন-রসের আস্বাদন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। উভয়ের মিলন-জনিত পরাক্রমও অত্যন্ত প্রবল। এই পরাক্রম তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে নিতান্ত অসহনীয়ই বা হইয়া উঠে, এই পরাক্রমে তাঁহার প্রাণবল্লভ কোনও সঙ্কটেই বা পতিত হয়েন, এই আশঙ্কাতেই বৃষভানু-নন্দিনী যেন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। বন্ধুর অনিষ্টের আশঙ্কাই বন্ধুহৃদয়ে সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠে। যেন এই ব্যাকুলতার তাড়নেই—কৃষ্ণগতপ্রাণা বৃষভানু-নন্দিনী মাদনাখ্য মহাভাবের পরাক্রম হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া—ভাবের পরাক্রম হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি-অঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্যই যেন, নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা তাঁহার প্রতি-অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। মনের উপরেই ভাবের পরাক্রম অত্যধিক; তাই যেন তিনি নিজের মনের দ্বারাও শ্রীকৃষ্ণের মনকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন। তাই শ্যামের রূপ দেখিয়া রাধারূপ বলিয়া মনে হয়, শ্যামের মন দেখিয়া রাধা-মন বলিয়া মনে হয়, শ্যামের চেষ্টা দেখিয়াও রাধার চেষ্টা বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সর্ব্বস্বা বৃষভানু-নন্দিনী আলিঙ্গন-দ্বারা স্বীয় প্রাণবল্লভকে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়াও যেন স্বস্তি অনুভব করিতেছেন না; হৃদয়-গুহায় লুকায়িত রাখিয়াও যেন আশ্বস্ত হইতেছেন না; বুঝি বা তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বাহির হইতে কোনও বিপদ্ আসিয়াই যদি তাঁহার প্রাণবল্লভকে আক্রমণ করে; সেই বহির্ব্বিপদের পরাক্রম তাঁহার নিজের অঙ্গেই ক্রিয়া করিবে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও দুঃখ নাই,—বরং তাতে একটু সুখের সম্ভাবনাই আছে, কারণ তাতে তাঁহার প্রাণবল্লভ নিরাপদে থাকিতে পারেন; কিন্তু বহির্ব্বিপদের তাড়নায় তাঁহার নিজের অঙ্গের প্রতিঘাত যদি তাঁহার প্রাণবল্লভের কুসুম-সুকোমল অঙ্গে পতিত হয়, তাহা হইলে না জানি তাঁহার কতই কষ্ট হইবে—এই আশঙ্কাতেই শ্রীরাধিকা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন; এই ব্যাকুলতার ফলেই যেন তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইল, বহির্ব্বিপদ হইতে তাঁহার প্রাণবল্লভকে রক্ষা করিবার জন্য বাহিরেও এক স্বরূপে অবস্থান করেন।

অথবা, মাদনাখ্য-মহাভাবের সহায়তায় স্বীয় মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কত আনন্দ পায়েন, ঐ আনন্দের

আতিশয্যে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যই বা কি পরিমাণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ ও আস্বাদন করিবার জন্য—এবং শ্রীকৃষ্ণের বাসনা-পূর্ত্তির সহায়তা করার জন্যই যেন বৃষভানু-নন্দিনী স্বতন্ত্র এক স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সমীপে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন।

অথবা, শ্রীরাধিকা—"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যার ভিতরে বাহিরে।" তিনি যখন আলিঙ্গন-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেন, অথবা হৃদয়ের অন্তস্তলে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন, তখন শ্রীকৃষ্ণ তো রহিলেন কেবল মাত্র তাঁহার ভিতরে—তাহাতে তাঁহাকে ভিতরে রাখিয়া যে ভাবে আস্বাদন করা যায়, তাহাই হইতে পারে; কিন্তু বাহিরে রাখিয়া আস্বাদনের তৃপ্তি লাভ করা যায় না। তাই বুঝিবা শ্রীরাধিকা স্বতন্ত্র এক স্বরূপে তাঁহার সমীপে থাকিবার ইচ্ছা করিলেন—যেন তাঁহার প্রাণবল্লভকে বাহিরে রাখিয়াও আস্বাদন করিতে পারেন।

নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর এই পৃথক্ স্বরূপই শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামী। শ্রীগদাধরে শ্রীমতী রাধিকার দক্ষিণা-নায়িকার ভাবই প্রকট বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী নিজের প্রতি অঙ্গদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে সর্ব্বতোভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাখা সত্ত্বেও কেন যে আবার স্বতন্ত্র একরূপে শ্রীগদাধর-পণ্ডিতরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাহা পরিষ্কার রূপে বুঝিবার জন্য আমরা একটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করিতেছি। এক শক্তিশালী যুবক তাহার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ একটী বালককে ঘুড়ি উড়ানের আনন্দ উপভোগ করাইবার জন্য মাঠে লইয়া গেল। মাঠে যাইয়া ঘুড়ি উড়াইয়া দিল; যুবক নিজের হাতেই ঘুড়ির সূতা ধরিয়া রহিল। ঘুড়ি বহু উপরে উঠিয়া বিচিত্ররূপে অঙ্গভঙ্গী দ্বারা দর্শকের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল। বালকটি ইহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাহাতে যুবকের প্রফুল্লতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল। যুবক নানা ভঙ্গীতে ঘুড়ি লইয়া খেলা করিতে লাগিল; তাহাতে নিজহাতে সূতা ধরিয়া ঘুড়ি উড়াইবার জন্য বালকের অত্যন্ত লালসা জন্মিল; এই লালসা-চরিতার্থতার আনন্দ হইতে যুবক তাহাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছুক নহে; কিন্তু তাহার হাতে সূতা ছাড়িয়া দিতেও আশঙ্কা হয়—পাছে সূতার টানে বালক পড়িয়া যায়, বা তাহার হাত কাটিয়া যায়; স্নেহবশতঃ এইরূপ আশঙ্কা যেমন বলবতী, বালকের হাতে সূতা ছাড়িয়া দিয়া তাহার বাসনা পূর্ণ করার ইচ্ছাও তেমনি বলবতী। যুবক বালকের হাতে সূতা দিল, কিন্তু তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, তাহাকে স্নেহভরে জড়াইরা ধরিয়া বালকের হাতের নিকট নিজের হাত দুখানি সূতায় সংযুক্ত করিয়া রাখিল,—যদিইবা সূতার প্রবল আকর্ষণে বালকের পড়িয়া যাওয়ার সম্ভাবনা উপস্থিত হয়, তাহা হইলে নিজে তাহাকে রক্ষা করিবে। সূতা ধরিয়া বালক বেশ আনন্দ পাইতেছে; কিন্তু এই আনন্দের উচ্ছ্বাসে বালকের মুখমণ্ডলে কি অপূর্ব্ব মাধুরী বিস্তারিত হইতেছে, যুবক পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাহা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে না। আবার বালকও যুবকের মুখ দেখিতে পাইতেছে না বলিয়া যেন সম্পূর্ণ আনন্দ উপভোগ করিতে পরিতেছে না। যুবকের ইচ্ছা হইল, বালককে ছাড়িয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখে; কিন্তু আশঙ্কায় বালককে ছাড়িতে পারিতেছে না—যদি যুগপৎই বালককে জড়াইয়া ধরা এবং বালক হইতে দূরে দাঁড়াইয়া তাহার রঙ্গ দেখা যুবকের পক্ষে সম্ভব হইত, তাহা হইলে বোধ হয় যুবকের সাধ মিটিত। কিন্তু যুবক সাধারণ মানুষ, তাহার পক্ষে যুগপৎ দুইস্থানে থাকা অসম্ভব। তাই, কখনও বা বালককে জড়াইয়া থাকে, কখনও বা সশঙ্কচিত্তে একটু দূরে দাঁড়াইয়া রঙ্গ দেখে। শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনীর অবস্থাও প্রায় এইরূপ। মাদনাখ্য-মহাভাবরূপ সূতার সাহায্যে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য-আস্বাদন রূপ ঘুড়ি উড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করিতেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিজের ইচ্ছা হইল—নিজেই সূতা ধরিয়া ঘুড়ি উড়ান; শ্রীরাধিকা তাঁহার হাতে সূতা দিলেন; কিন্তু যোগমায়ার শক্তিতে যুগপৎ শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া রহিলেন এবং স্বতন্ত্র এক মূর্ত্তিতে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত রূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার যে কত অনুরাগ, এবং উভয়ে উভয়ের নিকটে থাকিবার জন্য এবং উভয়ে উভয়ের আনন্দবৃদ্ধির জন্য তাঁহারা যে কত উৎকণ্ঠিত, তাহা দেখাইবার জন্যই এখানে এত কথা বলিতে হইল। নচেৎ সংক্ষেপে বলিলেই চলিত—শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং শ্রীরাধাই শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গোস্বামী।

এক্ষণে আমরা শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণের ও উক্তিগুলির একটু আলোচনা করিতে বাসনা করি।

প্রথমতঃ—তাঁহার ক্ষেত্রবাসের প্রতিজ্ঞা। ক্ষেত্র-বাসের প্রতিজ্ঞার মুখ্য এবং একমাত্র তাৎপর্য্য—শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকটে থাকা। ক্ষেত্রবাসের কথাটা তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিবার কৌশল বিশেষ। এইরূপ কৌশলময় বাক্য-বিন্যাস ও আচরণ ব্রজসুন্দরীগণের মধ্যেও বিরল ছিল না। তাঁহারা যমুনার ঘাটে যাইতেন—শ্রীকৃষ্ণের বদনচন্দ্র দর্শন করিবার নিমিত্ত—কিন্তু বাহিরে লোকের নিকট প্রকাশ করিতেন—'আমরা জল আনিবার জন্য যমুনায় যাইতেছি।' কিন্তু যদি তাঁহারা জানিতেন, যমুনার ঘাটে, বা যমুনার পথে শ্রীকৃষ্ণ নাই, তাহা হইলে যমুনায় যাওয়ার জন্য তাঁহাদের উৎকণ্ঠার আভাসও দৃষ্ট হইত না, তাঁহাদের যমুনায় যাওয়াও হইত না। পশ্চাদ্‌ভাগে স্থিত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত কণ্ঠের মুক্তামালার সূত্রচ্ছেদন; শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনের গূঢ় অভিপ্রায়ে মথুরার হাটে দধি-দুগ্ধ-বিক্রয়ের ছলে গৃহ হইতে বহির্গমন; এমন কি, শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও প্রচ্ছন্নতার আবরণে প্রেমপুষ্টির নিমিত্ত মথুরায় যাওয়ার কপটবাক্য-প্রয়োগ—ইত্যাদিই ব্রজসুন্দরীদিগের কৌশলময় চাতুর্য্য। প্রেমের স্বভাবেই এই সমস্তের স্ফুরণ। গদাধরও তো ব্রজসুন্দরী-শিরোমণি-শ্রীরাধিকা ব্যতীত অপর কেহ নহেন; সুতরাং তাঁহার প্রাণপ্রেষ্ঠ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গে মিলনের সুযোগ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যে ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্পরূপ একটী চাতুর্য্য প্রকটন করিবেন, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু যদি কাশীতে বাস করিতেন, গদাধরও কাশীতে বাস করার সঙ্কল্প করিতেন। ক্ষেত্রে বাস করিলে তিনি তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গের দর্শন পাইবেন, তাই তাঁহার ক্ষেত্রবাসের সঙ্কল্প। এখন, প্রভু ক্ষেত্র ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন, গৌরগতপ্রাণ গদাধর আর কিরূপে থাকেন? যতদিন ছোবড়ার ভিতরে নারিকেল থাকে, ততদিন ছোবড়ার আদর; যে ছোবড়ার মধ্যে নারিকেল নাই, কে তাহার আদর করে? তখন ছোবড়া থাকুক বা না থাকুক, কি আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক, তাহাতে নারিকেল-কামীর কিছু ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। যে ক্ষেত্রে শ্রীগৌর নাই, সেই ক্ষেত্রে বাস করিয়া গদাধরের কিছু মাত্র শান্তি নাই; বিশেষতঃ শ্রীগৌরের সঙ্গে থাকিলেই তাঁহার ক্ষেত্রবাস-সঙ্কল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। তাই তিনি গৌরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং বলিলেন—"ক্ষেত্র-সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল।"

তারপর শ্রীগোপীনাথের শ্রীমূর্ত্তিসেবা। শ্রীগদাধরের পক্ষে এই শ্রীমূর্ত্তি-সেবার দুইটী উদ্দেশ্য আছে; একটী বহিরঙ্গ বা আনুষঙ্গিক, অপরটী অন্তরঙ্গ বা মুখ্য। বহিরঙ্গ উদ্দেশ্যটী এই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা প্রকটনের বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য—কলিহত জীবকে ভজন শিক্ষা দেওয়া; তাই তিনি সাধক-জীবের ন্যায় নিজেও ভজন করিয়াছেন; গোবর্দ্ধনশিলার পূজাদিও করিয়াছেন। তাঁহার পরিকরবর্গও তাঁহার এই বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আনুকূল্যার্থ জীব-ভাবে ভজন করিয়াছেন। ভজনাঙ্গের মধ্যে শ্রীমূর্ত্তির সেবা অন্যতম মুখ্য অঙ্গ; ইহার "অল্পসঙ্গেই কৃষ্ণপ্রেম জন্মায়।" গদাধর-পণ্ডিতের পক্ষে শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ সেবার বহিরঙ্গ উদ্দেশ্য জীবকে ভজন-শিক্ষা দেওয়া—শ্রীবিগ্রহ-সেবার প্রয়োজনীয়তা সাধক-জীবের নিকটে জ্ঞাপন করা। শ্রীমন্মহাপ্রভু যতদিন নীলাচলে ছিলেন, ততদিন, এই শ্রীমূর্ত্তি-সেবার, তাঁহার ক্ষেত্রবাসের মুখ্য উদ্দেশ্য শ্রীগৌরের নিকটে থাকার, বিঘ্ন হইত না। কিন্তু যখন শ্রীগৌরসুন্দর কিছু দিনের জন্য নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন, তখন তাঁহার ভাবী বিরহের আশঙ্কায় গদাধর আকুল হইয়া পড়িলেন। মুখ্য উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য বলবতী উৎকণ্ঠায় তিনি তাঁহার আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য শ্রীমূর্ত্তিসেবার কথা যেন ভুলিয়াই গেলেন। বাস্তবিক মুখ্য ও আনুষঙ্গিকের মধ্যে সম্বন্ধ এই যে, মুখ্যকে বজায় রাখিয়া যদি পারা যায়, তবে আনুষঙ্গিক কাজটী করিতে হয়। আনুষঙ্গিকটীকে রক্ষা করিতে গেলে যদি মুখ্য কাজটিই উপেক্ষিত হইতে থাকে, তাহা হইলে কেহই আর আনুষঙ্গিক কাজে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে না। নিজের আহারের জন্যই লোক রন্ধন করিয়া থাকে; রন্ধনের পরে দুই এক মুষ্টি খাদ্য হয়তঃ অন্য কোনও প্রাণীকে দিয়া থাকে। এস্থলে নিজের আহারই হইল মুখ্য কার্য্য; অন্য প্রাণীকে দু এক মুষ্টি খাদ্য দেওয়া আনুষঙ্গিক কার্য্য। কিন্তু অন্য প্রাণীকে আহার্য্য দিতে গেলে যদি নিজকেই আহার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, তাহা হইলে কেহই অন্য প্রাণীকে কিছু দেয় না। অথবা, যে দিন নিজের আহারের জন্য রন্ধন করার

প্রয়োজন হয় না, সেই দিন,—কেবল অন্য প্রাণীকে দু এক মুষ্টি আহার্য্য দেওয়ার জন্য কেহই আর রন্ধন করে না।

যাহা হউক, এস্থলে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জীবশিক্ষার জন্য শ্রীমূর্ত্তিসেবা—গদাধর পণ্ডিতের পক্ষে আনুষঙ্গিক বা বহিরঙ্গ কার্য্য, কিন্তু মায়াবদ্ধ জীবের পক্ষে তাহা আনুষঙ্গিকও নহে, বহিরঙ্গও নহে; ইহা সাধক-জীবের একটী মুখ্য কর্ত্তব্য, সুতরাং কোনও সময়েই পরিত্যাজ্য নহে। বিশেষতঃ শ্রীগদাধর, শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহসেবামাত্র ত্যাগ করিয়া চলিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণসেবা ত্যাগ করেন নাই; সাক্ষাৎ-শ্রীকৃষ্ণরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের সাক্ষাৎ সেবার জন্যই বিগ্রহ-সেবা ত্যাগ করিতেছেন। জীবের ভাগ্যে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ সেবা যখন অসম্ভব, তখন শ্রীমূর্ত্তি-সেবার ত্যাগদ্বারাই তাহার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণসেবা-ত্যাগ বুঝাইবে।

এখন, শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের গোপীনাথসেবার মুখ্য বা অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যের বিষয় বিবেচনা করা যাউক। এই অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যও দুইটী, একটী শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সম্বন্ধে, অপরটী গদাধর-পণ্ডিতের নিজের সম্বন্ধে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু-সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যটী এই:—শ্রীরাধার ভাবে নিজের চিত্তকে বিভাবিত করিয়া, শ্রীরাধা-অভিমানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিবেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য আস্বাদন করিবেন, ইহাই গৌরলীলার উদ্দেশ্য। যাঁহারা শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের পরিকর, তাঁহাদের অন্তরঙ্গ বা মুখ্য কর্ত্তব্য হইল—ঐ উদ্দেশ্যসিদ্ধির আনুকূল্য করা। শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন—শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভাবাম্বুধিতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন। প্রিয় ব্যক্তির প্রতিকৃতি, প্রিয় ব্যক্তির ব্যবহারের জিনিস, এমন কি প্রিয় ব্যক্তির স্মৃতির বা কার্য্যকলাপের উদ্দীপক জিনিসমাত্রই লোকের নিকটে অত্যন্ত আদরের হইয়া থাকে; আর যাহারা ঐ সমস্ত জিনিসের প্রতি আদর প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহারাও তাহার অত্যন্ত প্রীতির পাত্র হইয়া উঠে। আমি যাঁহার সেবা করিতে ইচ্ছা করি, আমি যাঁহার প্রীতি সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি, আমার কর্ত্তব্য হইবে—তিনি যাহাতে সুখী হয়েন, তাহা করা। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর জীবনসর্ব্বস্ব; তাঁহার সেবার জন্য শ্রীমতী স্বজন-আর্য্যপথাদি সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীরাধার যে কত আদরের বস্তু, তাহা শ্রীমতী রাধিকা এবং তাহার অন্তরঙ্গ সখীগণ ব্যতীত অপর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই। রাধাভাব-সুবলিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের পক্ষেও শ্রীগোপীজনবল্লভের শ্রীবিগ্রহ ঠিক ততদূরই আদরের বস্তু। গৌরের প্রীতির জন্য গৌরের প্রাণের ধন শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ-সেবা গৌর-পরিকরগণের অত্যন্ত প্রাণারাম বস্তু। কৃষ্ণ-বিরহ-ব্যাকুলা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর সাক্ষাতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্রপট উপস্থিত করিয়া বিশাখা-সুন্দরী তাঁহার কথঞ্চিৎ স্থৈর্য্য আনয়ন করিয়াছিলেন—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের বিরহ-বিধুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের বিরহ-কাতরতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিবার পক্ষেও গদাধর-পণ্ডিতের শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহ ততদূর উপযোগী। শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে ভাবের উদ্দীপন হয়; সুতরাং লীলারসের পুষ্টি সাধিত হয়। এইরূপে ভাবের উদ্দীপন দ্বারা লীলারসের পুষ্টি সাধন করা, শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন করাইয়া কৃষ্ণ-বিরহ-কাতরতা কথঞ্চিৎ দূর করা,—ইত্যাদি শ্রীগদাধরের গোপীনাথ-সেবার প্রতি অন্তরঙ্গ কারণ। আবার, গদাধর গোপীনাথের সেবা করেন বলিয়া, তাঁহাকে দেখিলেই প্রভুর মনে হইত,—গদাধর গোপীনাথের সেবক; তখনই প্রভুর গোপীজন-বল্লভের কথা মনে হইত, সঙ্গে সঙ্গে গোপীজন-বল্লভের লীলাদির কথা মনে উঠিত, এবং মহাভাবের প্রবল তরঙ্গে চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিত।

গদাধর এইভাবে গোপীনাথ-সেবাদ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের লীলার সহায়তা করিতেন। কিন্তু গৌর যখন বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, তখন গদাধর বিগ্রহ-সেবা ত্যাগ করিয়া গৌরের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। ইহা শ্রীগদাধরের উদ্দেশ্যের প্রতিকূল নহে; বরং অনুকূলই। শ্রীবিগ্রহের সান্নিধ্যে ভাবের উদ্দীপনাদি হয়, বিরহকাতরতা প্রশমিত হয়। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের নিত্যলীলাস্থল শ্রীবৃন্দাবনধাম এই সকল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে যে বহুগুণে প্রশস্ত, তাহা বলাই বাহুল্য। আর সেই লীলাস্থলে যদি লীলার মুখ্য সহায় শ্রীমতী বৃন্দাবনবিহারিণীর অভিন্ন স্বরূপ শ্রীগদাধর স্বয়ং উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে যে ভাবের প্রবল বন্যায় রাধাভাবমূরতি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কি অবস্থা হইবে, তাহা একমাত্র রসিকজনবেদ্য।

কাহারও কোনও কার্য্যের বা আচরণের বিচার করিতে হইলে, কার্য্যের বা আচরণের প্রকারটা না দেখিয়া উদ্দেশ্য কি তাহাই দেখিতে হইবে। উদ্দেশ্য যদি ঠিক থাকে, তাহা হইলে প্রকার ভিন্নরূপ হইলেও দূষণীয় হইতে পারে না।

শ্রীমূর্ত্তি-সেবায় শ্রীগদাধরের নিজ-সম্বন্ধীয় অন্তরঙ্গ উদ্দেশ্যটী এই ঃ—গদাধর স্বরূপতঃ কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকা। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিত্য সেব্য। স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনের বিরহাবস্থায় তাঁহার শ্রীবিগ্রহই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন। ইহাই গদাধরের শ্রীবিগ্রহসেবার নিজস্ব অন্তরঙ্গ হেতু।

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন শ্রীবৃন্দাবন চলিলেন, গদাধর শ্রীবিগ্রহ সেবা ত্যাগ করিয়া গৌরের সঙ্গে চলিলেন। ইহাও তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রতিকূল হয় নাই। তাহার হেতু এই ঃ—স্বয়ংরূপের সেবার সাধ—বিগ্রহ-সেবায় মিটে না; নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের পক্ষে বিগ্রহাদি ভাবের উদ্দীপন করে মাত্র, স্বয়ংরূপের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা জন্মায় মাত্র; কিন্তু স্বয়ংরূপের সহিত মিলনজনিত লীলা-বিলাসাদিতে যে আনন্দ, তাহা বিগ্রহাদি হইতে দুর্ল্লভ। বিশাখাদত্ত চিত্রপট শ্রীরাধিকার ভাবের উদ্দীপন করিয়া কৃষ্ণসঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠা বাড়াইয়াছিল মাত্র, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আনন্দ দিয়া—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা প্রশমিত করিতে পারে নাই। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন কেবল চিত্রপট দেখিয়া বিরহ-বেদনা প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রজসুন্দরীগণ গৃহে বসিয়া থাকেন নাই; তাঁহারা বনে গিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে সেই কুঞ্জবিহারীকে অন্বেষণ করিয়াছেন—কৃষ্ণ যে বৃন্দাবনে নাই, তিনি যে মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, অনুরাগের বলবতী উৎকণ্ঠায় এবথা মহাভাববতী ব্রজসুন্দরীগণ ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, বুঝি রঙ্গ করিবার জন্য রসিকশেখর নাগর-চূড়ামণি কোনও কুঞ্জে লুকাইয়া রহিয়াছেন। তাই তাঁহারা কুঞ্জে কুঞ্জে কৃষ্ণকে অনুসন্ধান করিতেন। ইহা মহাভাবের স্বরূপগত ধর্ম্ম—সাধারণ জীবের ন্যায় মস্তিষ্ক-বিকৃত-জনিত ভ্রান্তি নহে। যাহাহউক, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত রাধিকা-স্বরূপ; প্রেমের স্বরূপগত ধর্ম্মের প্ররোচনায়, তিনি তাঁহার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে অনুসন্ধান করার জন্য শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছিলেন। স্বয়ংরূপের সহিত মিলনের উৎকণ্ঠায় বনে যাওয়ার সময় গৃহে কৃষ্ণের চিত্রপট ফেলিয়া যাওয়া যেমন শ্রীব্রজসুন্দরীগণের পক্ষে দূষণীয় নহে—ব্রজেন্দ্রনন্দনের লীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অনুসন্ধানের জন্য যাত্রাকালে ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীবিগ্রহ ফেলিয়া যাওয়াও শ্রীরাধিকা-স্বরূপ গদাধরের পক্ষে দূষণীয় হইতে পারে না।

তারপর, গদাধর-পণ্ডিত কাহার সঙ্গে যাইতেছেন, তাহাও বিবেচ্য। গদাধর স্বয়ং শ্রীরাধা; তিনি যাইতেছেন স্বয়ং-রাধারমণ-স্বরূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে; ইহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই; উভয়ের স্বরূপগত সম্বন্ধের প্রতিকূলও কিছু নাই। আবার, যাইতেছেন শ্রীবৃন্দাবনে—যাহা অপ্রাকৃত নবীন মদন—শ্রীরাধা-মদনগোপালের নিজস্ব ধাম। ব্রজব্যতীত অন্য কোনও স্থানে শ্রীরাধা-মদনগোপালের ব্রজভাবের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি হইতে পারে না; সখীজন-পরিবেষ্টিত শ্রীবৃষভানুনন্দিনী স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দনের সহিত মিলিত হইলেও ব্রজ ব্যতীত অন্যত্র তাঁহাদের স্বরূপানুবন্ধী ভাবের স্ফূর্ত্তি হয় না। কুরুক্ষেত্র-মিলনে আমরা তাহার প্রমাণ পাই—সেই বৃষভানুনন্দিনী, সেই ব্রজেন্দ্রনন্দনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন; আবার দীর্ঘবিরহের পরে মিলন বশতঃ উভয়ের মিলন নায়ক-নায়িকার নব-সঙ্গমের মতই চমৎকারিতা-দায়ক হইয়াছে; কিন্তু তথাপি শ্রীবৃষভানুনন্দিনী বলিতেছেন—"সেই তুমি সেই আমি সে নব সঙ্গম। তথাপি আমার মন হরে বৃন্দাবন॥ ব্রজে তোমার সঙ্গে যেই সুখ আস্বাদন। সে সুখ সমুদ্রের ইহাঁ নাহি এক কণ। আমা লঞা পুনঃলীলা কর বৃন্দাবনে। তবে আমার মনোবাঞ্ছা হয়েত পূরণে॥ * * * * প্রাণনাথ শুন মোর সত্য নিবেদন। ব্রজ আমার সদন, তাহতে তোমার সঙ্গম, না পাইলে না রহে জীবন॥ চৈঃ চঃ মধ্য ১৩ পরিচ্ছেদ।

এইরূপই শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা। স্বীয় জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপ শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর সঙ্গে—কৃষ্ণগত-প্রাণা-শ্রীবৃষভানুনন্দিনী-স্বরূপ শ্রীগদাধর-পণ্ডিত তাঁহাদের উভয়ের পূর্ব্বলীলাস্থলী এবম্বিধ মহিমান্বিত শ্রীবৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য যে স্বাভাবতঃই উৎকণ্ঠিত হইবেন, এবং এই প্রবল উৎকণ্ঠার প্রভাবে তিনি যে অন্য সমস্তই ভুলিয়া যাইবেন, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় তো কিছুই নাই। মহাভাবোচিত অনুরাগের প্রবল আকর্ষণে শ্রীগদাধর-পণ্ডিত তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের কথা,

কি ক্ষেত্রসন্ন্যাসের কথা যেন তাঁহার স্মৃতিপথেই উদিত হইল না; শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহাকে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেও যেন তাঁহার চৈতন্য হইল না; অনুরাগের খরস্রোতে তিনি ভাসিয়া চলিয়াছেন, কিছুতেই তাঁহাকে স্থগিত করিতে পারে না। প্রবল স্রোতে কেহ যখন তীব্রবেগে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতে থাকে, তখন তীরস্থিত বস্তুর প্রতি তাহার দৃষ্টিই পতিত হয় না। তীর হইতে তাহাকে ডাকিয়া তাহার মনোযোগ আকর্ষণের জন্য কেহ চেষ্টা করিলেও তাহা ব্যর্থ হইয়া যায়; আহ্বানকারীর শব্দ স্রোতের কলকল-নাদের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া যায়, তাহা আর ভাসমান ব্যক্তির কর্ণকুহরেই যেন প্রবেশ করিতে পারে না। শারদীয় মহারাসে শ্রীব্রজসুন্দরীদিগের এই অবস্থা হইয়াছিল। যেই মুহূর্ত্তে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিলেন, সেই মুহূর্ত্তেই উন্মত্তার ন্যায় তাঁহারা বনের দিকে ধাবিত হইলেন; যিনি যে অবস্থায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই ধাবিত হইলেন। যিনি আত্মীয়-স্বজনকে পরিবেশন করিতেছিলেন, বংশীধ্বনি শুনামাত্র, পরিবেশন-পাত্র তাঁহার হাত হইতে পড়িয়া গেল; তিনি কৃষ্ণানুরাগের প্রবল আকর্ষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। যিনি আত্মীয়ার শিশুকে ক্রোড়ে করিয়া গো-দুগ্ধ পান করাইতেছিলেন, শিশু কখন যে তাঁহার ক্রোড়চ্যুত হইয়া গেল, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না; তিনি দ্রুতবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন। আজই হয়তঃ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বস্ত্রহরণ-দিবসে-প্রতিশ্রুত মিলন সংঘটিত হইবে, ইহা মনে করিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য যিনি নানাবিধ অলঙ্কারাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-সামগ্রী তাঁহার দেহলতাকে সজ্জিত করিতেছিলেন—বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রে তিনিও বহির্গত হইয়া পড়িলেন; সজ্জা শেষ করার জন্য অপেক্ষা করিলেন না—সজ্জা শেষ করা হইল কিনা, তাহা বিবেচনা করার কথাও তাঁহার মনে উদিত হইল না। তাঁহারা এসব বিচার বিবেচনা করিবেন কিরূপে; বিচারের শক্তিতো তখন তাঁহাদের ছিল না। তাঁহাদের বলিতে যাহা কিছু, তৎসমস্তই তখন কৃষ্ণানুরাগের প্রবলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছে। যদি বিচার-শক্তি থাকিত, তবে হয়তঃ তাঁহারা মনে করিতেন—"শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্যই তো আমরা যাইতেছি; আচ্ছা, বেশ-ভূষা ঠিক করিয়া লই; যেন দেখিয়া কৃষ্ণ সুখী হয়েন।" এইরূপ চিন্তা ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় প্রেমের প্রতিকূল হইত না। তথাপি এতাদৃশী চিন্তাও তাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় নাই—বংশীধ্বনিরূপ প্রবলশক্তিসম্পন্ন রজ্জু যেন তাঁহাদিগকে কৃষ্ণসমীপে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। গদাধরপণ্ডিত-সম্বন্ধেও ঐ কথা; মহাভাবোচিত অনুরাগের প্রবল আকর্ষণে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সমীপে আকৃষ্ট হইয়াছেন—ব্রজসুন্দরীদিগের বেশ-ভূষা রচনার ন্যায়, কিম্বা তাঁহাদের ক্রোড়স্থ আত্মীয়-শিশুর ন্যায়, গোপীনাথ-বিগ্রহের কথাও তাঁহার মনেই স্থান পায় নাই। তিনি যে বিচার-পূর্ব্বক বিগ্রহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা নহে; বিচারের শক্তি তখন তাঁহার ছিল না। কোনও জড়বস্তুকে লোক যেমন রশি দিয়া জোরে টানিয়া লইয়া যায়, অনুরাগ-রাশিও তদ্রূপ গদাধরকে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী লিখিয়াছেন, শ্রীগদাধর-পণ্ডিত "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণ-সেবা ছাড়িল তৃণপ্রায়।" এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা অর্থে—শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ-সেবাই বুঝায়; কারণ শ্রীগদাধর গোপীনাথ-বিগ্রহসেবাই ছাড়িয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু এস্থলে "তৃণপ্রায়" শব্দের সার্থকতা কি?

সরলপ্রাণ শিশুদিগের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয় কোনও একটী বস্তু যদি তৃণের আবরণে লুক্কায়িত থাকে, আর যদি কোনও শিশু তাহা দেখিতে পায়, তাহা হইলে দেখা মাত্রেই ঐ শিশু সেই বস্তুটী লইয়া পলায়ন করিবে—যে স্থানে লইয়া গেলে ঐ বস্তুটী সে ইচ্ছানুরূপভাবে আস্বাদন করিতে পারিবে, সেই স্থানে না যাওয়া পর্য্যন্ত শিশু কিছুতেই নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে না। জিনিসটী নেওয়ার সময় হয়তঃ সে জিনিসের আবরণ-স্বরূপ তৃণগুলিকে ফেলিয়াই যাইবে; অথবা জিনিসটী বাহির করার সুযোগ না পাইলে, হয়তঃ তৃণসহই জিনিসটী লইয়া যাইবে। কিন্তু তৃণ লইয়া গেলেও তাহার অভীষ্ট স্থানে যাইয়া তৃণগুলিকে ফেলিয়া দিয়াই জিনিসটী আস্বাদন করিবে। এস্থানে, শিশু যে তৃণগুলিকে ফেলিয়া দেয়, তাহার হেতু তৃণের অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তা নহে; তৃণেতেও শিশুর প্রয়োজন আছে; তৃণ দ্বারাও শিশু খেলার সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া থাকে। তথাপি লোভনীয় বস্তুটী লইবার সময় শিশু তৃণগুলি ফেলিয়া দেয়। ইহার হেতু এই:—লোভনীয় বস্তুটী যখন পায়, তখন ঐ বস্তুর প্রতি গাঢ় লোভবশতঃ তাহাতেই

তাঁহার মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে নিবদ্ধ থাকে; তৃণের কথা তাহার মনেই উদিত হয় না—অবধানতাবশতঃই সে তৃণ ত্যাগ করিয়া যায়। ব্রজসুন্দরীদিগের বেশভূষা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত সুখজনক; ইহা ব্রজসুন্দরীগণও জানেন; এবং ইহা জানেন বলিয়াই তাঁহারা বেশভূষা করিয়া থাকেন। তথাপি শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রেই গাঢ় অনুরাগ-জনিত কৃষ্ণসঙ্গের প্রবল উৎকণ্ঠায় অসম্পূর্ণ বা বিপর্য্যস্ত বেশভূষা লইয়াই তাঁহারা উন্মাদিনীর মত ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। বেশভূষার অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তা ইহার কারণ নহে; কৃষ্ণসঙ্গের জন্য উৎকণ্ঠাধিক্যে বেশভূষার প্রতি অনবধানতাই ইহার হেতু; তাঁহারাও বেশভূষা-রচনার চেষ্টাকে "তৃণবৎ" ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর-পণ্ডিত সম্বন্ধেও ঐ কথা। তিনি যখনই শুনিলেন, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর তাঁহার পূর্ব্বলীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে যাইতেছেন, তখনই সেই বৃন্দাবনে তাঁহার সাক্ষাৎ-সেবার জন্য গদাধরের চিত্ত এতই উৎকণ্ঠিত হইল যে, অন্য কোনও বিষয়ই তাঁহার চিত্তে আর স্থান পাইল না—"প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা"র কথা তিনি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবাকে" যে তৃণের সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে, তাহা তাহাদের অকিঞ্চিৎকরতা বা নিষ্প্রয়োজনীয়তার অংশে নহে, অত্যন্ত লোভনীয়-বস্তু লাভের জন্য প্রবল-উৎকণ্ঠাবশতঃ তাহাদের রক্ষণ-বিষয়ে অনবধানতাংশেই তাহাদের তুল্যতা। সাধকজীবের পক্ষে এইরূপ অনুরাগোৎকণ্ঠা অসম্ভব। গদাধর-পণ্ডিতের আচরণের দোহাই দিয়া যে সকল সাধকজীব শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ত্যাগকরতঃ একমাত্র গৌরের সেবা করিতেই প্রয়াসী, তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, শ্রীপণ্ডিতগোস্বামী শ্রীকৃষ্ণ-বিগ্রহ-সেবামাত্র ছাড়িয়া যাইতেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা ছাড়েন নাই। তাঁহাদের আরও বিবেচনা করা উচিত যে, তাঁহাদের কৃষ্ণসেবাত্যাগ বিচারমূলকই হইবে প্রেমোৎকণ্ঠাজাত অনবধানতামূলক হইবে না। যেখানে প্রেম আছে, সেখানে এইজাতীয় বিচারের স্থান নাই।

আর একটী বিবেচনার বিষয় এই যে, উপাস্যের প্রীতিসম্পাদনই সেবা; উপাস্য কিসে সুখী হয়েন, তাহাই দেখিতে হইবে—সাধক কিসে সুখী হয়েন, তাহা সাধকের অনুসন্ধানের বিষয় নহে। শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সুখজনক; শ্রীকৃষ্ণের ভজনশিক্ষা দেওয়াই শ্রীমন্-মহাপ্রভুর লীলার একটী উদ্দেশ্য—তিনি সর্ব্বত্রই কৃষ্ণ-ভজনের উপদেশ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং কৃষ্ণ-ভজন ত্যাগ করিলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কিরূপে প্রসন্ন হইতে পারেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আবার শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলার মুখ্য উদ্দেশ্যও ব্রজলীলার এবং শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের আস্বাদন করা। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা ও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য এতই লোভনীয় বস্তু যে, ইহার জন্য পূর্ণকাম শ্রীভগবান্ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে লালসাগ্রস্ত হইয়াছিলেন। এই লালসাই গৌর-লীলার হেতু। ব্রজলীলা এবং ব্রজেন্দ্রনন্দনের মাধুর্য্য যে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কত আদরের বস্তু, ইহা হইতেই তাহা বুঝা যায়।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত কটক পর্য্যন্ত প্রভুর অনুসরণ করিলেন। প্রভু অন্তরে গদাধরের প্রতি সন্তুষ্ট। "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবা" ত্যাগের জন্য প্রভু সন্তুষ্ট নহেন; যে অনুরাগের আধিক্যে "প্রতিজ্ঞা-কৃষ্ণসেবার" প্রতি গদাধরের অনবধানতা জন্মিয়াছে, সেই অনুরাগাধিক্য দেখিয়াই সন্তুষ্ট। প্রভু জানেন—গদাধর সঙ্গে থাকিলেই তাঁহার পূর্ব্বলীলাস্থলী শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহার পক্ষে ব্রজ-রসাস্বাদনের প্রাচুর্য্য সম্ভব হইবে; প্রভু জানেন,—গদাধরকে তাঁহার সঙ্গসুখ হইতে বঞ্চিত করিলে, তাঁহার নিজেরই বা কত কষ্ট হইবে, আর গদাধরেরই বা কত কষ্ট হইবে। তথাপি তিনি গদাধরকে তাঁহার সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিলেন—দৃঢ়কণ্ঠে তাঁহাকে নীলাচলে যাওয়ার আদেশ দিলেন। কুসুম-কোমল-হৃদয় প্রভু গদাধরের প্রতি এত কঠোর হইলেন কেন? জীবের জন্য। প্রভু এবার পতিত-পাবন অবতার। কলিহত জীবের মঙ্গলের জন্যই তিনি অবতীর্ণ হইয়াছেন। যদি গাদাধরকে সঙ্গে লইয়া যায়েন—মায়ামুগ্ধ জীব মনে করিবেন—"গদাধর পণ্ডিত তো শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের সেবা ত্যাগ করিয়া গৌরের সঙ্গেই চলিয়া গেলেন। গৌরও তাঁহাকে নিষেধ করিলেন না; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবার কোনও প্রয়োজনই নাই, কেবল গৌরের সেবাই কলি-জীবের কর্ত্তব্য।" তাই পরমকরুণ প্রভু সহস্রবৃশ্চিকদংশন-তুচ্ছকারি-বিরহ-যন্ত্রণা সহ্য করিয়াও জীবের ভজনের আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে গদাধরকে নীলাচলে শ্রীগোপীনাথের সেবায় পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামীর এই আচরণের দুইটী অংশ। প্রথমে তিনি গোপীনাথের সেবা ত্যাগ করিয়া যায়েন, পরে গৌরের আদেশে আবার গোপীনাথের সেবা করার জন্য নীলাচলে যায়েন। পণ্ডিত-গোস্বামীর আচরণকেই যদি আমাদের ভজনের বিধি-নির্দ্দেশক বলিয়া মনে করিতে হয়, তবে—পূর্ব্ববিধি অপেক্ষা পরবিধিই বলবান্—এই ন্যায়ানুসারে শ্রীকৃষ্ণসেবার বিধিই তো আমরা পাইয়া থাকি।

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা অদ্বয়-জ্ঞান-তত্ত্বের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ; উভয় লীলাই স্বরূপতঃ এক; কিন্তু এক হইলেও ব্রজলীলাই, নবদ্বীপলীলার মূল; ব্রজলীলারূপ নির্ঝর সমূহ হইতেই নবদ্বীপ-লীলাতরঙ্গিণী সম্পুষ্টা। শ্রীকৃষ্ণসেবা বাদ পড়িলে, ব্রজলীলারূপ নির্ঝর-সমূহ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় বলিয়াই মনে হয়; তাহাতে নবদ্বীপলীলা পুষ্ট হইবে কিরূপে? যদি কেহ বলেন, "কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, চারিদিকে বহে যাহা হ'তে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে।"—ইত্যাদি প্রমাণে বুঝা যায়, শ্রীগৌরলীলা-রসে নিমগ্ন হইতে পারিলে ব্রজলীলা স্বতঃই স্ফুরিত হইবে (গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে)। তাহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে—গৌরলীলায় নিমগ্ন হইতে পারিলেই যে ব্রজলীলা স্ফুরিত হইবে, ইহা ধ্রুবসত্য, এবং ব্রজলীলারস আস্বাদনের অন্যপন্থাও যে নাই, ইহাও সত্য। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার বিরোধী, তাঁহাদের পক্ষে গৌর-লীলারসে নিমগ্ন হওয়া সম্ভব কি না, তাহাও বিবেচ্য; কারণ, এইরূপ নিমগ্নতা শ্রীগৌরের কৃপাসাপেক্ষ; গৌরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, গৌরের প্রাণারামবস্তু ব্রজলীলাকেও উপেক্ষা করিয়া, গৌরের কৃপালাভের আশা আমাদের হীনবুদ্ধিতে আত্মবঞ্চনার প্রয়াস বলিয়াই মনে হয়। শ্রীকৃষ্ণকে উপেক্ষা করিয়া শ্রীগৌরের কৃপালাভের চেষ্টা, বৃক্ষের মূল কাটিয়া শাখায় ফল-উৎপাদনের চেষ্টার মত—অথবা কুক্কুটীর সম্মুখ ভাগ পোষণ করিতে গেলে তাহার আহার যোগাইতে হয়, সুতরাং কিছু ব্যয় বহন করিতেও হয় বলিয়া, তাহার গলাটা কাটিয়া ফেলিয়া, কেবল লাভজনক-ডিম্ব-প্রসবকারী পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করার প্রয়াসের ন্যায় বলিয়াই মনে হয়।